আলোচনা অনুষ্ঠান

প্রতিপাদ্যঃ

চলমান সংকট নিরসনে

আদর্শিক লড়াইয়ের অপরিহার্যতা

বিষয়সূচি

চলমান সংকট নিরসনে আদর্শিক লড়াইয়ের অপরিহার্যতা

১ বিশ্বরাজনীতিতে ধর্ম বৃহত্তম ফ্যাক্টর হিসাবে আবির্ভূত.....৩

১ ধর্মবিশ্বাসকে মুছে ফেলা কেন সম্ভব হয় নি?.....৩

১ ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষতার উপজাত হিসাবে ধর্মবিদ্বেষের প্রসার.....৫

১ ধর্মকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার উপায় ধর্মের প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার.....৭

১ ধর্ম কী? ধার্মিক কারা?.....৮

১ এবাদত কী? কাদের প্রার্থনা কবুল হবে না?.....৯

১ জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় ধর্মবিশ্বাস.....৯

১ ইসলাম সম্পর্কে সমালোচনার পথ রুদ্ধ নয়.....১২

১ আদর্শিক লড়াইয়ের উপাদান আছে হেযবুত তওহীদের কাছে.....১৩

এক নজরে হেযবুত তওহীদ.....১৩

১৩ জুন ২০১৫ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার ভবনস্থ শহীদ শফিউর রহমান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার প্রতিপাদ্য বিষয়

সৌজন্য মূল্যঃ ২০ টাকা মাত্র

চলমান সংকট নিরসনে

আদর্শিক লড়াইয়ের অপরিহার্যতা

ধর্ম বৃহত্তম ফ্যাক্টর হিসাবে আবির্ভূতঃ

বর্তমানের বিশ্ব রাজনীতিতে ধর্ম প্রধান একটি ইস্যু (Prime Factor)। ধর্মনিরপেক্ষতা, মুক্তচিন্া, বিজ্ঞানমনস্কতা, বাকস্বাধীনতা ইত্যাদি ধারণার অপপ্রয়োগের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিন দিন চরম হয়ে উঠছে। যে সব দেশে যুদ্ধ চলছে সেখানে ধর্মবিদ্বেষই মূল ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। পাশ্চাত্যে আজ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণে ইসলামবিদ্বেষ বিস্তার করা হচ্ছে। এক মহাযুদ্ধের কালোমেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠছে, এমন কি সেই যুদ্ধ টুইন টাওয়ার হামলার মাধ্যমে শুরু হয়ে গেছে বলাও অসংগত হবে না। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর রাজনীতিতেও ধর্ম প্রধান ইস্যু। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সবগুলো দেশেই ধর্মীয় সন্ত্রাস থাবা বিস্তার করেছে। সরকারগুলো তা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে কারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই, সেখানে পূর্ণ আধিপত্য বিভিন্ন ধরনের ধর্মব্যবসায়ীদের। তারা ফতোয়াবাজি করে প্রগতি ও মুক্তচিন্তার সকল পথ রুদ্ধ করছে, শিল্প-সংস্কৃতির চর্চাকে বাধাগ্রস্ত করছে। তাদের কথায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মঘাতী হচ্ছে, এখানে ওখানে বোমা মেরে মানুষ হত্যা করছে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। অপরদিকে পরাশক্তি এই জঙ্গিদেরকে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের গুটি হিসাবে ব্যবহার করছে।

ধর্মব্যবসা সকল ধর্মে নিষিদ্ধ হলেও কোনো ধর্মীয় কাজই টাকা ছাড়া সমাধা হয় না। কিছু ধর্মব্যবসায়ী ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির মিথস্ক্রিয়া করে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে ভোট আদায় ও বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করছে। আরো বহুভাবে চলছে বিবিধ প্রকার ধর্মবাণিজ্য। পরকালীন মুক্তির আশায় এসব ধর্মব্যবসায়ীদের কথা শুনে মানুষ যা করছে তাতে তাদের ব্যক্তিগত বা জাতির কোনো লাভ হচ্ছে না, বরং তারা ইহকাল ও পরকাল দুটোই হারাচ্ছে।

বর্তমান বিশ্বের, বিশেষত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর কর্ণধারদের কাছে ধর্মবিশ্বাস একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন একটি ছুতা পেলেই শুরু হয় ধর্মীয় উন্মাদনাকে হাতিয়ার বানিয়ে আন্দোলন, ভাঙচুর ইত্যাদি। ঐ সকল রাষ্ট্র পরিচালকগণ ধর্মকে না পারছেন গঠনমূলক কাজে লাগাতে, না পারছেন ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ রাখতে, না পারছেন একেবারে মুছে ফেলতে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসকে অবজ্ঞাও তারা করতে পারছেন না। কারণ তারাই তো ভোটার, তাদের ধর্মীয় অনুভূতিকে তোয়াজ করে না চললে নির্বাচনে তার জবাব মিলবে। তাই আমাদের রাষ্ট্রনায়করা ধর্মকে রাষ্ট্রের ঐক্য, শৃঙ্খলা, উন্নতি কিংবা প্রগতির কাজে লাগাতে না পারলেও ধর্মকে দিবসের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমিত রেখেছেন এবং এটুকু সতর্ক আছেন যেন রাষ্ট্রক্ষমতা মৌলবাদী শক্তির হাতে চলে না যায়। কেননা সেটা দেশের জন্য যেমন অকল্যাণকর তেমনি সার্বভৌমত্বের জন্যও হুমকির কারণ হতে পারে।

ধর্মবিশ্বাসকে মুছে ফেলা কেন সম্ভব হয় নি?

‘ধর্ম ব্যক্তিগত আর রাষ্ট্র সামষ্টিক’- এমন ধারণা সৃষ্টি হয়েছে মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে; যখন ইউরোপে একটি বস্তুবাদী সভ্যতা স্থাপিত হয় যার মূলভাব হচ্ছে, “বর্তমানের এই জ্ঞান-বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির যুগে ধর্ম আর প্রযোজ্য নয়। যারা ব্যক্তিগতভাবে স্রষ্টায় বিশ্বাস করতে চায়, উপাসনা করতে চায় করুক, কিন্তু ধর্ম দিয়ে রাষ্ট্র চলবে না, কারণ ধর্মগুলো বর্তমানের আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনায় ভূমিকা রাখতে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তাই রাষ্ট্র চলবে মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থা দিয়ে।” এই দর্শনকে বাস্তবরূপ দিতে গিয়ে প্রচারমাধ্যম ও শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে ধর্মকেই মুছে ফেলার প্রয়াস চালানো হয়েছে। ধর্মকে পশ্চাৎপদতা, কুসংস্কার, অন্ধত্ব ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে মানুষকে ধর্মহীন করে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তা সফল হয় নি এবং সফল হবেও না। কারণঃ

ক) প্রতিটি মানুষের মধ্যে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই স্রষ্টার আত্মা, রূহ আছে (সুরা হিজর ২৯)। এর শক্তিশালী প্রভাব মানুষের চিন্া-চেতনায় ক্রিয়াশীল থাকে। এজন্য যখনই তারা বিপদাপন্ন হয় তখন প্রতি নিঃশ্বাসে স্রষ্টার কাছেই আশ্রয় চায়। স্রষ্টাকে বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট রকম উপাদান প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যেগুলো পবিত্র কোর’আনে আল্লাহ আয়াত বা নিদর্শন বলেছেন, যার সামনে মানুষের মস্ক অবনত হয়। এগুলো দেখার পরও কেবল একটি শ্রেণির প্রচারণায় মানুষ নাস্কি পরিণত হবে না। আল্লাহর নাজেলকৃত ধর্মগ্রন্থগুলোর বেশ কয়েকটি এখনও মানুষের কাছে আছে যেগুলো স্রষ্টার অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। মানুষ সেগুলো সম্মানের সঙ্গে পড়ছে, জানছে, বিচার বিশ্লেষণ করছে। এগুলোর স্বর্গীয় বাণীসমূহ মানুষের আত্মার গভীরে প্রভাব ফেলছে। অধিকাংশ মানুষ সেগুলোকে মাথায় করে রাখছে, সম্মানকে যেমন যত্ন করা

হয় সেভাবে যত্ন করছে। সুতরাং মানবজাতিকে ধর্মহীন করে ফেলার চেষ্টা অপ্রাকৃতিক, বাস্তবতাবর্জিত, নিতান্তই অর্বাচীন ও মূঢ়তাসুলভ পরিকল্পনা।

খ) অতীতে হাজার হাজার হয়তো লক্ষ লক্ষ বছর মানুষকে শান্তি দিয়েছে ধর্ম। এই ইতিহাস মানুষের জানা আছে। সময়ের সেই বিশাল ব্যাপ্তির তুলনায় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, প্রথাগত রাজতন্ত্র ইত্যাদির শাসনামল এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র এবং এগুলোর অভিজ্ঞতাও শান্তিময় নয়। এ মতবাদগুলো সম্পর্কে বলা যায়- Perfect in theory --- has never worked in practice. (তাত্ত্বিকভাবে নিখুঁত কিন্তু কখনো কাজে বাস্তবায়িত হয় নি।) পক্ষান্তরে ধর্মের শাসনে প্রাপ্ত সেই অনুপম শান্তির স্মৃতি মানবজাতির মন থেকে মুছে যায় নি। অধিকাংশ মানুষ এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে একমাত্র স্রষ্টার বিধানেই শান্তি আসা সম্ভব। কাজেই যুগের হাওয়া তাদেরকে যতই অন্য দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুক, তারা শান্তির আশায় বারবার ধর্মের পানেই মুখ ফেরায়। উপরন্তু প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, শেষ যুগে (কলিযুগ, আখেরি যামানা, ঞযব খধংঃ যড়ঁৎ), আবার ধর্মের শাসন বা সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ বৈরিতা থাকবে না, কোনো অবিচার, অন্যায় শোষণ থাকবে না, পৃথিবীটা জান্নাতের মত শান্তিময় (Kingdom of Heaven) হবে। এই বিশ্বাস থেকে অধিকাংশ মানুষ ধর্মের উত্থানই কামনা করে। এটা তাদের ঈমানের অঙ্গ, এ বিশ্বাস মানুষের অন্তর থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

গ) শান্তির আশায় ধর্মের পানে ছুটে চলা মানুষকে ফেরাতে চাইলে স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন হবে ধর্মের বিকল্প (Alternative Ideology) এমন একটি জীবনব্যবস্থা প্রণয়ন যা তাদেরকে সেই কাঙ্ক্ষিত শান্তি দিতে পারবে, একই সঙ্গে দেহ ও আত্মার প্রশান্তি বিধান করতে পারে। কিন্তু সত্যি বলতে কি সেটা মানুষ আজ পর্যন্ত করতে পারে নি এবং কোনো কালে পারবেও না। বহু চেষ্টা করেছে কিন্তু সবই মাকাল ফল। শান্তির শ্বেতকপোত গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক বা রাজতান্ত্রিক কারো হাতেই ধরা দেয় নি। ধরুন, যদি কোনো ব্যক্তিকে বলা হয় যে, তুমি কীভাবে মরতে চাও? গুলি খেয়ে না বিষ খেয়ে? বাঁচার কোনো পথ নেই, কেবল মরার জন্য দু'টো পথ। ঐ মানুষটিকে একটা না একটা পথ বেছে নিতেই হবে। মানুষের আবিষ্কৃত জীবনব্যবস্থাগুলোকে যত সুন্দর সুন্দর নামেই ডাকা হোক না কেন তা হচ্ছে মানবজাতির সামনে মৃত্যুর বিকল্প পথ। জীবনের পথ একটাই; আর সেটা হলো ধর্ম অর্থাৎ স্রষ্টাপ্রদত্ত দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। বর্তমান স্রষ্টাবর্জিত ভোগবাদ, দেহসর্বস্ব জীবনদর্শন মানুষকে কেবল মনুষ্যত্বের অধঃপতন আর নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর জীবন উপহার দিয়েছে। কাজেই মানুষ এখন জীবন রক্ষার আশায় ধর্মের দিকেই যেতে চাইবে, কেননা তাদের বস্তুত শান্তি দরকার। কিন্তু মরিচিকা যেমন তৃষিতকে তৃপ্ত করতে পারে না, আরো ক্লিষ্ট করে তেমনি ১৩০০ বছর ধরে বহুভাবে বিকৃত হওয়া ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মগুলোও মানুষকে কেবল সুখস্বপ্নে বিভোর করে প্রতারিতই করে এবং করবে। সেগুলো আর মানুষের ধর্ম নয়, কল্যাণের ধর্ম নয়, সেগুলো পুরোহিত-আলেম, পীর, রাজনীতিক স্বার্থান্বেষী, ডানপন্থী, রক্ষণশীল আর উগ্রপন্থী জঙ্গিদের ধর্ম। নজরুল লিখেছেন,

তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু

নাই মানুষের দাবি,

মোল্লা পুরুত লাগায়েছে তার

সকল দুয়ারে চাবি।

এই ধর্মব্যবসায়ীরা মানুষকে শান্তি দিতে চায় না, চাইলেও পারবে না। কারণ প্রথমত এদের পথ ভুল, দ্বিতীয়ত এরা তো কেবল ক্ষমতা ও স্বার্থের উপাসক। কাজেই সমাজকে শান্তিময় করতে এখন একটাই করণীয়, মানুষের ঈমান তথা ধর্মবিশ্বাসকে সঠিক পথে চালিত করে ধর্মকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। এটা করতে হলে সর্বপ্রথম সমাজকে সর্বপ্রকার ধর্মব্যবসায়ী (Religion monger) থেকে মুক্ত করতে হবে, তাদের জন্য নিষিদ্ধ ও প্রাদুর্ভাব বন্ধ করতে হবে। এখনো সময় আছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজচিন্তক, বুদ্ধিজীবী, গণমাধ্যমকর্মী, সাধারণ মানুষ, রাজনীতিক সকলকেই বুঝতে হবে যে, ধর্মবিশ্বাসকে অস্বীকার করে কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করার চেষ্টা চাঁদের আলোয় কাপড় শুকানোর মত। বিগত পাঁচশত বছর এই স্বপ্ন বহুভাবে দেখা হয়েছে, কিন্তু এখন আর স্বপ্ন দেখার সময় নেই, জেগে উঠে কাজে নামার সময় হয়েছে। অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে হবে।

ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষতার উপজাত হিসাবে ধর্মবিদ্বেষের প্রসারঃ

ইউরোপীয়রা ধর্মকে ব্যক্তিজীবনে নির্বাসন দিয়েছিল কারণ ঈসা (আ.) যে শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন সেটা ছিল মূলত ব্যক্তির আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য। জাতীয় জীবন পরিচালনার বিধান তাঁর আনার প্রয়োজন পড়ে নি, কেননা সেটা পূর্বের কেতাব তওরাতেই ছিল। কিন্তু ইউরোপে শুধু

খ্রিষ্টধর্মের শিক্ষা দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে দণ্ডবিধি, অর্থনীতি ইত্যাদি না থাকায় ধর্মযাজকরা নিজেরাই নিজেদের মনগড়া বিধানকে ঈশ্বরের বিধান বলে চালিয়ে দিতেন। সমগ্র ইউরোপেই কয়েক শ' বছর ধরে রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে স্বার্থ ও কর্তৃত্ব নিয়ে প্রচণ্ড বিরোধ চলেছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছিল, মধ্যযুগীয় বর্বরতার শিকার হয়েছিল কোটি কোটি মানুষ। ধর্মের নামে চলা অধর্ম (বিশেষত খ্রিষ্ট ধর্মের) আর যাজকদের অযৌক্তিক কর্মকাণ্ড দেখে ধর্ম থেকে আস্থা হারিয়ে কিছু সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, দার্শনিক, চিন্তানায়কসহ বিরাট সংখ্যক মানুষ ধর্মকেই মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের মন থেকে ধর্ম বিশ্বাস একেবারেই মুছে ফেলা সম্ভব নয়। উপায়ান্তর না পেয়ে ১৫৩৭ সনে ব্রিটিশ রাজা অষ্টম হেনরির সময়ে ধর্মকে ব্যক্তিজীবনে আবদ্ধ করা হয় এবং রাজা হন সার্বভৌম কর্তৃত্বের মালিক। এই রাষ্ট্রনীতি সমগ্র ইউরোপে গৃহীত হয়।

ইতোমধ্যে সমস্ত মুসলিম দুনিয়া তাদের নবীর রেখে যাওয়া আদর্শ পরিত্যাগ করে বহু ফেরকা মাজহাবে, বহু অন্তর্মুখী বিকৃত সুফি তরিকায়, রাজনীতিকভাবে বহু রাজ্য-সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়ে বিশৃঙ্খলা, ভোগবিলাস ইত্যাদির মধ্যে ডুবে গিয়ে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ল যে তাদের উপর আল্লাহর গজব হিসাবে নাজেল হলো ইউরোপীয় ছোট ছোট জাতিগুলো। এক সময়ের প্রবল পরাক্রান্ত মুসলিম জাতিকে পদানত করে মুসলিমদের মেরুদণ্ড চিরতরে গুড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারা একটি সুগভীর ষড়যন্ত্র করল। তারা একটি বিকৃত ও বিপরীতমুখী ইসলাম রচনা করে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এ জাতিকে শিক্ষা দিতে শুরু করল। তবে পবিত্র কোর'আনকে বিকৃত করতে পারল না কারণ এটি সংরক্ষণের ভার আল্লাহ নিজে নিয়েছেন (সুরা হেজর ৯)। তাদের তৈরি 'ইসলামে' জাতীয় জীবনের বিষয়গুলোকে গুরুত্বহীন করে ব্যক্তিগত মাসলা-মাসায়েলের প্রতি এবং আনুষ্ঠানিক উপাসনার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হলো। সেখানে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জেহাদকে বাদ দিয়ে নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করাকেই বড় জেহাদ বলে শেখানো হলো। মুসলিম জাতি যেন আর কোনোদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে না পারে, সেজন্য ইসলামের যে বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন ফেরকা, মাজহাবের মধ্যে বিস্তর মতবিরোধ, দলাদলি ছিল এবং আছে সেগুলোকেই বেশি জোর দিয়ে শেখানো হলো। ফলে এই জাতি নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে মারামারি, বাহাস, তর্কবিতর্কে জড়িত হয়ে পড়ল। মাদ্রাসাগুলোতে কোনো কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হলো না, যেন এখান থেকে বেরিয়ে আসবে তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য নামাজ পড়ানো, জানাজা পড়ানো, ওয়াজ করা, কোর'আন খতম করা, মিলাদ পড়ানো ইত্যাদি কাজ করতে অর্থাৎ আলেম সেজে পৌরোহিত্য করতে বাধ্য হয় এবং তাদের দ্বারা ঐ বিকৃত ইসলামটিই মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। ১৭৮১ সনে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতায় আমাদের এই উপমহাদেশের প্রথম মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে ১৯২৭ সন পর্যন্ত একাদিক্রমে ২৭ জন্য খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী প্রাচ্যবিদ আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে থেকে এ জাতিকে ইসলাম শিক্ষা দেয়। এভাবে ১৪৬ বছরের শিক্ষায় এ জাতির মধ্যে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদের (Orientalists) তৈরি করা ইসলামটিই সর্বত্র গৃহীত হয়ে যায়।

মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা নামে আরেকটি শিক্ষাব্যবস্থা ঔপনিবেশিকরা বিশ্বজুড়ে চালু করল যার উদ্দেশ্য ছিল মূলত উপনিবেশ পরিচালনার জন্য আজ্ঞাবহ কিছু কেরানি তৈরি করা। এদেরকে ধর্মের শিক্ষা তেমন দেওয়া হলো না, বরং সুকৌশলে এদের মনে ধর্ম সম্পর্কে সন্দেহ ও বিদ্বেষভাব গেঁড়ে দেওয়া হলো। এরা নিজেদেরকে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের থেকে অনেক উন্নত শ্রেণি বলে ভাবতে শিখল আর মানসিকতায় ইউরোপীয় প্রভুদের প্রতি হীনম্মন্যতায় আপ্লুত হতে শিখল।

কিন্তু "ধর্ম ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয় জীবনে তার কোনো অংশ নেই" এ দর্শনটি ইউরোপীয় সমাজে গৃহীত হলেও, মুসলিমদের মধ্যে সর্বতোভাবে গৃহীত হলো না। কারণ ইসলামে মানুষের সামগ্রিক জীবনের বিধান আছে। তবুও ইউরোপীয়রা যে মুসলিম দেশগুলো দখল করে নিয়েছিল সেখানে জাতীয় জীবন থেকে ইসলামকে ছেটে ব্যক্তিজীবনে সীমিত করে ফেলল আর ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থা এখানেও চাপিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু আল্লাহ যাকে দুটো সুস্থ পা দিয়েছেন সে কতকাল হুইল চেয়ারে চলাফেরা করবে? তাই ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থা বিগত তিনশো বছরে মুসলিমদের উপর যতই চাপানোর চেষ্টা করা হলো, মুসলিমদের একটি অংশের মধ্যে ততোই সামষ্টিক জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেতনা জাগ্রত থাকল। এখানেই ঘটল বিপত্তি। তারা জানল না তাদের সামনে যে ইসলামটি আছে সেটা আর প্রকৃত রূপে নেই, সেটা বহু আগেই বিকৃত ও বিপরীতমুখী হয়ে গেছে, সেটা দিয়ে আর শান্তি আসবে না। উপরন্তু সেটা অতি বিশ্লেষণকারী ফকিহ, এমাম, পণ্ডিতদের দ্বারা এতটাই জটিল ও দুর্বোধ্য রূপ নিয়েছে যে সেটা সাধারণ মানুষের জ্ঞানের বাইরে চলে গেছে। তাই ধর্মীয় বিষয়ে তারা ঐ মাদ্রাসা শিক্ষিত ধর্মব্যবসায়ীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ল আর ধর্মব্যবসায়ীরাও মানুষের ঈমানকে ভুল পথে চালিত করে স্বার্থ হাসিল করতে সচেষ্ট হলো। শান্তির ধর্ম হয়ে গেল অশান্তির উৎস।

ধর্মকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার উপায় ধর্মের প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার:

এই যে ধর্মকে আজ জাতির অকল্যাণে ব্যবহার করা হচ্ছে, এটা সম্ভব হয়েছে একটিমাত্র কারণে তা হচ্ছে, ধর্ম খুবই সংবেদনশীল একটি বিষয়, এ ব্যাপারে মানুষ খুবই অনুভূতিপ্রবণ। মানুষ তার হৃদয়ের গভীরে স্রষ্টা, ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মপ্রবর্তকগণের প্রতি সযত্নে শ্রদ্ধা লালন করে। ধর্মের

উপর আঘাত হানলে মানুষ উত্তেজিত হয়ে হেন কর্ম নেই যা করতে পারে না। এই উত্তেজিত করার কাজটি খুব নিপুণভাবে করতে পারে ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি। এটা চরম সত্য যে, ধর্ম থেকে পার্থিব স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে শুধুমাত্র ধর্মব্যবসায়ীরা। তারা পার্থিব স্বার্থ ছাড়া ধর্মের কোনো কাজই করতে রাজি নয়। কিন্তু সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষ ধর্মকে পরকালীন জীবনের পথ ও পাথেয় মনে করে, ধর্মের প্রতিটি কাজ তারা করে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে। ধর্মব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থে হাতিয়ার হিসেবে মানুষের এই নিঃস্বার্থ ধর্মপরায়ণতাকে ব্যবহার করে, মানুষের ঈমানকে, ধর্মীয় চেতনাকে ওয়াজ করে উত্তেজিত করে ভুল পথে প্রবাহিত করে। কোটি কোটি ভোটার ভোটদানকালে তাদের ধর্মবিশ্বাস (ঈমান) দ্বারা প্রভাবিত হয়। ধর্মব্যবসায়ীরা বলে যে, অমুক ব্যক্তি ইসলামের শত্রু, কাফের, তাকে হত্যা করলে সেটা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ হিসাবে গণ্য হবে। অথবা বলে যে, অমুক দল ধর্মদ্রোহী, তাদেরকে মারলে জান্নাত নিশ্চিত, তাদের দ্বারা নিহত হলে শহীদ, বাঁচলে গাজি। মানুষ সরল বিশ্বাসে তাদের কথায় ভুল পথে পা বাড়ায় এবং হত্যাকাণ্ডসহ বিবিধ সহিংস ঘটনা ঘটায়। ধর্মের অপব্যাখ্যা করে মানুষকে দিয়ে অধর্মের কাজ করানোর চেয়ে বড় পাপ ও প্রতারণা আর হতে পারে না। কারণ তাদের কথায় পবিত্র জেহাদ মনে করে আখেরাতে পুরস্কারের আশায় মানুষ ইসলাম তথা ধর্ম-পরিপন্থী কাজগুলো করে। কিন্তু বাস্তবে সে হয় চরম ক্ষতিগ্রস্ত। সে তার ইহকাল-পরকাল দুটোই হারাবে। আর যারা তাদের ঈমানকে হাইজ্যাক বা লুট করে এভাবে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করবে, হাশরের দিন আল্লাহর কাছে তাদেরও জবাব দিতে হবে, সঙ্গে আরো বহু মানুষের পাপের বোঝাও তাদেরকে বহন করতে হবে। আল্লাহ তাদের সম্পর্কেই বলেছেন, আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল (সুরা বাকারা-১৭৫)।

কিন্তু সেটা তো আখেরাতের বিষয়, বর্তমানে এই ধর্মজাত ফেতনা থেকে আমাদের মুক্তির উপায় কী? এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে মানুষের ধর্মবিশ্বাস (ঈমান)-কে সঠিক পথে পরিচালিত করা। আবারও বলছি, মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে জীবনের জাতীয় ক্ষেত্রে অস্বীকার করার যেমন কোনো উপায় নেই, তেমনি অবজ্ঞা করারও কোনো সুযোগ নেই বরং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসকে সঠিক পথে (Channeling faith to the right direction) পরিচালিত করতে হবে। আমাদের দেশের ৯০ ভাগ মুসলমানসহ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সকলেই কমবেশি ধর্মপ্রাণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের একটি বিরাট অংশকে ইতোমধ্যেই ধর্মব্যবসায়ীরা বিভ্রান্ত করে ফেলেছে। ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রের অন্যতম ফসল 'সাম্প্রদায়িকতা' যেন এক ঘুমন্ত বাঘ এবং ধর্মব্যবসায়ীরা তাকে জাগিয়ে তুলতে সদা-উদগ্রীব। ১৯৪৭ সনে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ ছিল এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে চিরজীবী করার দীর্ঘ ষড়যন্ত্রের পরিণতিমাত্র। ব্রিটিশ থেকে ভারত-পাকিস্তান ভাগের সময় ১৯৪৭ সালে হিন্দু ও মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রায় ৫ লাখ লোক নিহত হয়। বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন ও একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালেও ধর্মবিশ্বাসের অপপ্রয়োগ হয়েছিল দারুণভাবে।

ধর্মীয় উন্মাদনা থেকেই জঙ্গিবাদের সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক সহিংসতার সঙ্গে ধর্মীয় উন্মাদনা যোগফল আমাদের জাতীয় জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। এর প্রতিকার হিসাবে গতানুগতিকভাবে শক্তি প্রয়োগের পন্থাই অবলম্বন করা হয় এবং ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা প্ররোচিত বৃহত্তর জনসংখ্যার ঈমানকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয় না। যার পরিণামে দেশে ভয়াবহ অচলাবস্থা ও গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে যা এদেশের মানুষকে মৌলবাদী, উগ্রবাদী হিসাবে বিশ্বমহলে চিত্রিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। তাই এ ধারণা করা বিরাট বড় ভুল যে, সাধারণ মানুষ কোনো ফ্যাক্টর নয়, তারা কিছু বোঝে না, তারা মান্ধাতার আমলের বাসিন্দা। কেননা তাদের ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট খাটো করে দেখার মতো নয়, সেটা অবশ্যই বড় ফ্যাক্টর যদি তা কারো দ্বারা ভুল খাতে প্রবাহিত হয়। তাই সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির চাবি আর কোনোভাবেই ধর্মব্যবসায়ীদের হাতে রাখা যাবে না। রাখলে পরিণাম হতে পারে সিরিয়া, মিশর, ফিলিস্তিন, আলজেরিয়া, তিউনেশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশগুলোর মতোই। পক্ষান্তরে মানুষের এই ঈমানকে সঠিকপথে পরিচালিত করা হলে তখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দেশের সম্পদ পাহারা দিতে গিয়ে গলদঘর্ম হতে হবে না, বরং ধর্মপ্রাণ মানুষেরা বিনা পয়সায় দেশ ও দশের সম্পদ পাহারা দেবে।

এজন্য প্রথমেই কয়েকটি মৌলিক বিষয় মানুষকে জানাতে হবে যেমন- ধর্মের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য মানবতার কল্যাণ। ধর্মব্যবসা সকল ধর্মে নিষিদ্ধ। ধর্মকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে ধর্মব্যবসায়ীরা কীভাবে মানুষকে প্রতারিত করছে, কীভাবে মানুষের ইহকাল ও পরকালকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, কীভাবে তারা মিথ্যা ফতোয়াবাজি ও ধর্মের অপব্যাখ্যা দ্বারা সমাজে অন্যায়, অশান্তি, দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতা বিস্তার করছে আর নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে এসব বিষয় সাধারণ মানুষকে জানাতে হবে। এটা করতে পারলে সমাজ ধর্মব্যবসার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে। পাশাপাশি ধর্মের গায়ে লেগে থাকা অধর্মগুলোকে চিহ্নিত করে ধুয়ে ফেলে ধর্মকে নির্মল করতে হবে। ধর্মের সত্য ও সুন্দর রূপটিকে যদি মানুষের সামনে তুলে ধরা যায় তাহলে আলো ও অন্ধকার, সাদা ও কালো পৃথক হতে সময় লাগবে না। এ কাজটিই আমরা হেযবুত তওহীদ এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর পক্ষ থেকে করে যাচ্ছি। আমাদের কথা হচ্ছে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ, ধর্মের উদ্দেশ্যও মানবকল্যাণ। তাহলে কেন ধর্ম ও রাষ্ট্র একত্রে কাজ করতে পারবে না? অবশ্যই পারবে, তবে সেজন্য ধর্মকে ঘৃণা করে নয়, প্রত্যাখ্যান করে নয়, ধর্মবিশ্বাসীদেরকে অবজ্ঞা করে নয়, বরং সঠিক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে ধর্মকে জাতীয় উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে। মানুষের ঈমান জাতির উন্নতি-

প্রগতি-সমৃদ্ধির মূল নিয়ামকে পরিণত হবে তখনই লাগবে যখন ধর্মের কয়েকটি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত সত্য জাতির সকলে জানতে পারবে। যেমন:

ধর্ম কী? ধার্মিক কারা?

ধর্ম শব্দের অর্থ ধারণ করা। কোনো বস্তু, প্রাণি বা শক্তি যে বৈশিষ্ট্য বা গুণ ধারণ করে সেটাই হচ্ছে তার ধর্ম। আগুনের ধর্ম পোড়ানো। পোড়ানোর ক্ষমতা হারালে সে তার ধর্ম হারালো। মানুষের ধর্ম কী? মানুষের ধর্ম হচ্ছে মানবতা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যের দুঃখ-কষ্ট হৃদয়ে অনুভব করে এবং সেটা দূর করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায় সে-ই ধার্মিক। অথচ প্রচলিত ধারণা হচ্ছে যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট লেবাস ধারণ করে সুরা কালাম, শাস্ত্র মুখস্থ বলতে পারে, নামায-রোযা, পূজা, প্রার্থনা করে সে-ই ধার্মিক।

এবাদত কী?

কাদের উপাসনা কবুল হবে না?

আল্লাহর এবাদত করার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে (সুরা যারিয়াত ৫৬)। এবাদত হচ্ছে যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেই কাজটি করা। গাড়ি তৈরি হয়েছে পরিবহনের কাজে ব্যবহারের জন্য, এটা করাই গাড়ির এবাদত। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতিনিধি (Representative) হিসাবে (সুরা বাকারা-৩০)। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিকে আল্লাহ যেভাবে সুশৃঙ্খল, শান্পিূর্ণ রেখেছেন ঠিক সেভাবে এ পৃথিবীকে শান্পিূর্ণ ও সুশৃঙ্খল রাখাই মানুষের এবাদত। ধরুন আপনি গভীর রাত্রে প্রার্থনায় মগ। হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে 'আগুন আগুন' বলে আর্তচিৎকার ভেসে এল। আপনি কী করবেন? দৌড়ে যাবেন সাহায্য করতে নাকি চোখ-কান বন্ধ করে প্রার্থনা চালিয়ে যাবেন। যদি আগুন নেভাতে যান সেটাই হবে আপনার এবাদত। আর যদি ভাবেন- বিপন্ন ব্যক্তি অন্য ধর্মের লোক, তাহলে আপনার মধ্যে মানুষের ধর্ম নেই, আপনার নামায-রোযা, প্রার্থনা সবই পণ্ডশ্রম।

প্রমাণ: আল্লাহ মুসা (আ.) কে বলছেন, 'আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন এলাহ (হুকুমদাতা) নেই, অতএব আমার এবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাহ কায়েম কর (সুরা ত্বা-হা: ১৪)। এমনই আরো অনেক আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে এবাদত ও সালাহ আলাদা বিষয়। প্রকৃতপক্ষে এবাদত হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব। মুসার (আ.) দায়িত্ব অর্থাৎ এবাদত কী ছিল তা আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিলেন। বললেন, 'ফেরাউনের নিকট যাও, সে দারুণ উদ্ধত হয়ে গেছে (সুরা ত্বা-হা: ২৪)। আল্লাহ তাঁকে ফেরাউনের কাছে পাঠালেন অত্যাচারিত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ইহুদি জাতিকে দাসত্বের কবল থেকে মুক্ত করে তাদের মানবাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, মানবতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

সমাজের যারা আল্লাহওয়ালা লোক তারা সমাজকে অপশক্তির হাতে ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তিগত নাজাতের চিন্তায় মশগুল, আর ধর্মব্যবসায়ীরা ব্যস্ত স্বার্থসন্ধানে। যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পালন করলে তাদের রোজগার ও ভোজনবিলাসের সম্ভাবনা থাকে সেগুলোকেই তারা জোর দেন। মসজিদে-মাদ্রাসায় দান করার জন্য দানবাক্স-মাইক নিয়ে তাদেরকে ওয়াজ করতে দেখা যায়, কিন্তু ব্রিজ, কালভার্ট, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল বা বাসগৃহ নির্মাণ অর্থাৎ কোনো প্রকার জাতীয় উন্নয়নের কাজে অংশ নিতে তারা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন না। এবাদতের সঠিক অর্থ না বোঝার কারণে নির্যাতিতের হাহাকার, ক্ষুধার্তের ক্রন্দন মহা ধার্মিকদের কানে প্রবেশ করে না। এগুলোকে দুনিয়াবি কাজ বলে এড়িয়ে যাবার মতো পাশবিক মনোবৃত্তি তাদের তৈরি হয়েছে। আমরা কোর'আন হাদীস থেকে প্রমাণ করে দিয়েছি যে, স্বার্থপরের নামাজ নেই, স্বার্থপরের সমাজ নেই, স্বার্থপরের জান্নাত নেই। একইভাবে যে আলেমের জ্ঞান বা যে ধনীর ধন মানুষের কল্যাণে লাগে না, সে আলেম ও ধনীকে আল্লাহরও প্রয়োজন নেই।

জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় ধর্মবিশ্বাস:

জঙ্গিবাদ বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংকট। বাংলাদেশেও জঙ্গিবাদ হানা দিয়েছে। জঙ্গিবাদের ইস্যুতে বিশ্বের বহু দেশে এই মুহূর্তে যুদ্ধ চলছে। আমাদের দেশেরও ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলিম এবং সমগ্র বিশ্বে মুসলিমদেরকেই সন্ত্রাসী হিসাবে পরিচিত করে তুলতে ব্যাপক প্রপাগান্ডা চালানো হচ্ছে যার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।

জঙ্গিবাদের মোকাবেলায় যত বেশি শক্তিপ্রয়োগ করা হচ্ছে ততই জঙ্গিবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা অনুমাননির্ভর কথা নয়, এটা পরিসংখ্যান। এত কঠোরতা ও জিরো টলারেন্স সত্ত্বেও কেন জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের প্রধান প্রধান শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো ব্যর্থ হচ্ছে, হবে এবং কী উপায়ে সফলভাবে জঙ্গিবাদ নির্মূল করা যেতে পারে এ বিষয়ে আমরা আমাদের প্রস্তাবনা তুলে ধরছি।

শক্তিপ্রয়োগ অপরাধ দমনের অন্যতম উপায়, তবে প্রধান উপায় হচ্ছে শিক্ষা। এ কারণে শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়। সুশিক্ষা একটি জাতিকে নৈতিক বলে বলীয়ান করে তোলে যা চরিত্রের মধ্যে প্রোথিত হয়ে তাকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা মানবসভ্যতা অনাদিকাল থেকে পাপ, গোনাহ, অপরাধ ও আইনভঙ্গ থেকে ফিরিয়ে রেখে মানবতা, দেশপ্রেম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। জঙ্গিবাদ কোনো সাধারণ অপরাধ নয়, এটি একটি আদর্শিক সন্ত্রাসবাদ যার প্রতিবিধানের জন্য রাষ্ট্রগুলোর হাতে শক্তিপ্রয়োগ ব্যতীত অন্য কোনো পন্থা নেই; উপরন্তু যে ধর্ম মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত রাখার কথা সেই ধর্মের অপব্যাখ্যা দ্বারাই মানুষ জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের পন্থা যে ফলপ্রসূ হচ্ছে না, অন্য উপায় লাগবে এ কথাটি এখন অনেকেই অনুভব করছেন। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকগণ বলছেন যে, জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে হবে, সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, জঙ্গিবাদের বিপরীতে তাদেরকে অনুপ্রাণিত ও প্রণোদিত (Motivate) করতে হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে কী বললে জঙ্গিরা তাদের পথ পরিত্যাগ করবে এবং নতুন করে কেউ আর জঙ্গি হবে না? এবং কীভাবে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে?

যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য তার উৎপত্তি সম্পর্কে আগে জানতে হয়। এটা যদি একটা অসুখের মতো হয় এবং এর জন্য ডাক্তার দেখানো হয়, সেক্ষেত্রে ডাক্তারের প্রথম কাজ কি হবে? তিনি প্রথমে রোগীর লক্ষণগুলো দেখবেন যে এ রোগের ফলে রোগী কি ধরনের আচরণ করছে এবং এ আচরণের ফলে তার এবং তার আশেপাশের মানুষের কী ধরনের ক্ষতি হচ্ছে। তারপরই তিনি ভাববেন এটার উৎপত্তির কারণ কি? উৎপত্তির কারণ না জেনে চিকিৎসা করলে ওষুধপত্র দিয়ে সাময়িকভাবে রোগের লক্ষণ (যেমন জ্বর) দূর করা গেলেও রোগ নির্মূল করা যাবে না, সেটা বার বার হবে। একইভাবে জঙ্গিদেরকে যদি জঙ্গিবাদ থেকে ফেরাতেই হয় তাহলে তা করতে হবে জঙ্গিবাদের উৎপত্তিস্থল থেকে। জঙ্গিবাদের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে? ধর্মের বিকৃত শিক্ষা থেকে। অতএব, যারা জঙ্গিদেরকে ধর্ম থেকেই যুক্তি তুলে ধরে বোঝাতে হবে যে, এটা সঠিক পথ নয়। রোগের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিষেধক জরুরি। জঙ্গিবাদের প্রতিকার করার ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে বটে কিন্তু প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আদর্শের কোনো বিকল্প নেই।

এখন এই বিষয়টি জনগণকে বোঝাতে হলে যেসব বিষয়বস্তু, তথ্য প্রমাণ, ধর্মীয় যুক্তি দরকার যা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবে তা বর্তমান ধর্মীয় শিক্ষায় নেই, সাধারণ শিক্ষায়ও নেই। কিন্তু সেই আদর্শ আমাদের কাছে আছে। আমাদের এমামুয্যামান তাঁর অভিমত ২০০৯ সনে একটি পত্রের মারফত বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জঙ্গিবাদ ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যার ফল। শক্তিপ্রয়োগের পাশাপাশি সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলে জঙ্গিবাদ নির্মূল করা সম্ভব। তিনি এই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সরকারকে সহযোগিতা করার প্রস্তাব করেছিলেন।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ইদানীং আল্লাহ-রসুলের সম্পর্কে কটূক্তিকারীদেরকে গোপনে ও প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। যারা রসুলাল্লাহকে নিজেদের জীবনের থেকেও বেশি ভালোবাসেন, তাদের অনুভূতিকে অবজ্ঞা করার কোনো উপায় নাই, ঠিক একইভাবে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির অভিলাসী বাম আদর্শকেও আমরা অবজ্ঞা করতে পারি না। যে কোনো নিঃস্বার্থ আদর্শকে অস্বীকার করাই অনৈতিক, যদিও সব আদর্শ পরিণামে মানুষকে শান্তি দিতে সফল হয় না। যাহোক যারা এই হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটাচ্ছে তাদেরকে আমরা বলতে পারি, তুমি যে রসুলকে গালাগালি করার কারণে তাকে মেরে ফেললে এটা কি রসুলাল্লাহর রেখে যাওয়া আদর্শ, পন্থা (সুন্নাহ) মোতাবেক সঠিক হলো? যদি না হয়ে থাকে তাহলে তোমার এই কাজে আল্লাহও সন্তুষ্ট হবেন না, রসুলাল্লাহও সন্তুষ্ট হবেন না। আগে তোমাকে বুঝতে হবে এই কাজের ক্ষেত্রে রসুলাল্লাহর নীতি কি? রসুলাল্লাহর ১৩ বছরের মক্কী জীবনে তাঁকে কী নির্যাতন, অপমান, অপদস্থই না করা হয়েছে, তিনি কি পারতেন না তাঁর অনুগত আসহাবদেরকে দিয়ে বিরোধী নেতৃবৃন্দকে গুপ্তহত্যা করাতে, জ্বালাও পোড়াও, ভাঙচুর করাতে? তিনি তা করেন নি। আমাদের দেশের একটি ধর্মান্ধ শ্রেণি প্রায়ই ইসলামবিদ্বেষীদের কর্মকাণ্ডে মূর্খের ন্যায় উত্তেজিত হয়ে নিজ দেশের সম্পদ, রাস্তাঘাট ভাঙচুর করেন, নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করেন। কিন্তু আল্লাহর রসুল তা করেন নি। তিনি অটল, অনড়, সংশপ্তক হয়ে সত্যের প্রচার ও প্রকাশ ঘটিয়ে গেছেন। একটা সময় তাঁর জীবনে এসেছে যখন ঐ বিরোধীরা নবীর প্রচারিত সত্যকে গ্রহণ করে তাঁরই অনুসারী হয়ে গেছেন। আর যারা বিরোধিতায় অটল ছিল তারা কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে। তাই গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাস সৃষ্টির মতো নিষ্ফল প্রয়াস না করে কার্যকর পদক্ষেপ হলো জাতিকে ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করা, জাতি ঐক্যবদ্ধ হলে প্রাকৃতিক নিয়মেই বিজয় তাদেরকে অনুসরণ করবে। গত তেরশ বছর ধরে মুসলিম জাতিটির মধ্যে শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা করে লক্ষ-কোটি মুসলিম দাবিদার মারা যাচ্ছে। আজও সিরিয়া, ইরাক, ইয়ামেন, আরব, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশে শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা অব্যাহত আছে। গত ৫ বছরে সিরিয়াতে আড়াই লক্ষ মানুষ এই অন্তর্কোন্দলে নিহত হয়েছে। মসজিদে হামলা চালিয়ে এক মুসুল্লি আরেক মুসুল্লিকে হত্যা করছে। জাতির এই যখন অভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন ইসলাম-বিদ্বেষী শ্রেণি ইসলামের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা চালাতেই পারে। এই সুযোগ থাকবে না যদি এই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। তাই রসুলের সুন্নাহ হচ্ছে সেটা করা। জঙ্গিদেরকে বোঝাতে হবে যে, তোমরা যে কাজ করছ তা দ্বারা

তোমরা একূল ওকূল দু'টিই হারাচ্ছো। এতে তোমার সওয়াব হবে না বরং গুনাহ হবে। আর ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর যে এজেন্ডা পশ্চিমা বিশ্ব নিয়েছে সেটা তাতে আরো বৃদ্ধি পাবে। তাদের কাছে আছে বিরাট বিশাল সামরিক শক্তি, এবং আছে প্রভূত পার্থিব সম্পদ। পক্ষান্তরে এই ক্ষুদ্রসংখ্যক জঙ্গিদের কাছে ওসব কিছুই নেই, তাদের পার্থিব সম্পদ, তেল গ্যাস ইত্যাদিও তাদের হাতে নেই, সেগুলো তাদের সরকারগুলোর হাতে, যারা ইতোমধ্যেই পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর পায়ে সাজদায় প্রণত হয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে কার্যত অস্বীকার করে পশ্চিমা শক্তি ও জীবনদর্শনকেই প্রভু ও বিধাতা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং মরিয়া হয়ে তারা ভুল কাজ করছেন। তারা এখানে ওখানে বোমা ফাটাচ্ছেন, পর্যটন কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করছেন। তাতে পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর কোন ক্ষতি না হওয়ায় তারা শরীরে বোমা বেঁধে আত্মঘাতি হচ্ছেন। এতে প্রতিপক্ষের কী ক্ষতি হোয়েছে? ধরতে গেলে কিছুই না। টুইন টাওয়ার গেছে তাতে কী হয়েছে? এখন ঐ স্থানেই সেই টুইন টাওয়ারের চেয়েও বড় টাওয়ার তৈরি করেছে। বরং এতে প্রতিপক্ষের লাভই হচ্ছে। পৃথিবীর মানুষকে সে বলছে যে– দেখ! এরা কী রকম সন্ত্রাসী। এরা নিরীহ নিরপরাধ মানুষ, স্ত্রীলোক, শিশু হত্যা করছে। এদের ধর, মার, জেলে দাও, ফাঁসি দাও। পৃথিবী তার এ কথা মেনে নিয়েছে এবং তার নির্দেশ মোতাবেক তা-ই করছে, কারণ ইংরাজি প্রবাদ বাক্য গরমযঃ রং ৎরমযঃ অর্থাৎ মহাশক্তিধরের কথাই ঠিক।

এই কথাগুলো জঙ্গিবাদীদেরকে বোঝাতে হবে যে, তোমাদের এই কাজের দ্বারাই তোমাদের প্রতিপক্ষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। সেই ঐক্যের সামনে তোমরা দাঁড়াতেই পারবে না। যেমনটা হয়েছে শার্লি হেবদোর ঘটনায়। যে পত্রিকা কেউ চিনত না, সেটার নাম এখন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মুখে মুখে। সুতরাং এই ভুল পন্থা ছাড়ো। এই ব্যাপারটি বোঝানোর পরের কাজ দুইটি।

প্রথমত, যারা ইতোমধ্যেই জঙ্গি হয়ে গেছে তারা নৈতিক বল হারিয়ে ফেলবে, তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আর একাজে যাবে না। তারা সবাই হুট করেই পূর্ণভাবে নিবৃত হয়ে যাবে এটা আমরা বলছি না। কিন্তু তারা অধিকাংশই নিজেদের কাজ সম্পর্কে দ্বিধান্বিত হয়ে যাবে। তারা একটা মধ্যবর্তী অবস্থায় উপনীত হবে। এই দ্বিধাই তাদেরকে বেপরোয়া হতে বাধা দেবে।

দ্বিতীয়ত, আরেকটা ভাগ রয়ে যাবে যারা তারপরও ওই ধরনের কর্মকাণ্ড করতেই থাকবে। কিন্তু তখন তাদের সংখ্যা হবে কম। তখন তাদেরকে নিবৃত্ত করতে রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রয়োজন পড়বে। জনগণ প্রকৃত শিক্ষা পেলে স্বভাবতই সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে উঠবে, তারা সরকারকে জঙ্গিদমনে সহযোগিতা করবে, জঙ্গিদের রিক্রুটমেন্টও বন্ধ হবে। জঙ্গিদের সংখ্যা কম থাকলে রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগে তা নির্মূল করা সম্ভব হবে। এই শিক্ষা দিতে হবে সর্বতোভাবে, উভয়প্রকার শিক্ষাব্যবস্থায় এবং গণমাধ্যমের দ্বারা। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে একটি শিক্ষাকে আমরা উদাহরণ হিসাবে দিলাম, এমন বহু বিষয় আছে যা জঙ্গিবাদ ও এর উৎপত্তির প্রতিটি পথ বন্ধ করে দিতে সক্ষম হবে এটা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি।

কিন্তু এখন যদি রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করে উগ্রপন্থী ইসলামিস্টদের দমন করতে চায় তাহলে জনসাধারণের ধর্মানুভূতি, ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সুযোগ পাবে। কারণ তাদের আছে ধর্মনেতার ভাবমূর্তি। তারা সাধারণ জনগণকে বলবে দেখ আমরা রসুলের জন্য এতোকিছু করছি অথচ সরকার আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে। অতএব সরকার ইসলামবিরোধী, নাস্কি, তার বিরুদ্ধে জেহাদ করার ফতোয়াও তারা দিয়ে দিতে পারে। আমাদের দেশে অতীতে এটা বহুবার হয়েছে। প্রতিবারই জনগণ তাদের কথায় প্রভাবিত হয়েছে।

ইসলাম সম্পর্কে সমালোচনার পথ রুদ্ধ নয়

ইসলামপ্রিয় মানুষদেরকে আজ বুঝতে হবে, ইসলাম একটি আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা (Ideology বা complete code of life)। কাজেই অন্য কোনো আদর্শের অনুসারীরা এর সমালোচনা করতেই পারেন, তাদের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি তলে ধরতে পারেন। আল্লাহ নিজেই তাঁর সৃষ্টির এবং কোর'আনের অসঙ্গতি খুঁজে বের করার জন্য আহ্বান করেছেন। তিনি বলেছেন, তুমি করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফেরাও, কোন ভুল দেখতে পাও কি? অতপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে। [সুরা মুলক আয়াতঃ ৩-৪] এখানে আল্লাহ শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন তাফওয়াতিন যার অর্থ ঋধষঃ, ঋষধ, অসামঞ্জস্য, বৈপরিত্য, ভুল এবং ফুতুরিন যার অর্থ খুঁত, ফাটল, চিড়, ভাঙ্গন, ত্রুটি, অসঙ্গতি ইত্যাদি (আরবী-বাংলা অভিধান ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫০, ইফাবা)। কাজেই আল্লাহ স্বয়ং যেখানে তাঁর কোর'আন সম্পর্কে, সৃষ্টি সম্পর্কে, আয়াত এমন কি তাঁর নিজের সম্পর্কে ভুল সন্ধান করার জন্য আহ্বান করছেন, সেখানে কেউ যদি ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনা করে, তার দৃষ্টিতে ধরা পড়া কোনো অসঙ্গতি তুলে ধরে তাহলে তার বিরুদ্ধে আক্রোশ প্রদর্শন করা, তাকে আক্রমণ করা, তাকে হত্যা করা ইত্যাদি অবশ্যই অন্যায্য, অপ্রগতিশীল, ক্ষুদ্রতা, অযৌক্তিক, আল্লাহর অভিপ্রায় বহির্ভূত কাজ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে যেটা করণীয় তা হচ্ছে, যুক্তি-তর্ক দিয়ে নিজেদের মতামতকে সমুন্নত করা এবং মিথ্যা অভিযোগ ব্যর্থ প্রমাণ করা। এ কাজটিই আল্লাহ করেছেন তাঁর সমগ্র কোর'আনময়।

অন্যদিকে যারা কূপমণ্ডুক ধর্মব্যবসায়ীদের অযৌক্তিক কর্মকাণ্ড দেখে আল্লাহ-রসুল, ধর্মগ্রন্থসমূহ, অবতারগণ এবং তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে কটূক্তি করে, ব্যাঙ্গচিত্র এঁকে, অশ্লীল সাহিত্য লিখছেন তাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য হলো, সমালোচনা এক জিনিস আর গালিগালাজ আরেক জিনিস। কুৎসিত ধর্মবিদ্বেষী আচার আচরণ করে ধর্মবিশ্বাসী মানুষের মনে আঘাত করে দেশে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা কোনোভাবেই বিজ্ঞানমনস্কতা, মুক্তমনের পরিচায়ক নয়। ইসলামের বিরুদ্ধে তথ্য-উপাত্ত ইত্যাদি উপস্থাপন করে গঠনমূলক যৌক্তিক সমালোচনা করুন।

তবে আজ থেকে ১৪শ' বছর আগের শিক্ষা-দীক্ষাহীন, সামরিক শক্তিহীন, ঐক্যহীন, শৃঙ্খলাহীন, লক্ষ্যহীন, সর্ববিষয়ে পশ্চাৎপদ, দারিদ্র্যের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত, বংশানুক্রমে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পারস্পরিক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত, এক কথায় আরব গোত্রভিত্তিক অসভ্য বেদুইন জনগোষ্ঠীকে যিনি একটি অর্ধবিশ্বজয়ী, সুসংগঠিত, দুর্দান্ত গতিশীল, সুশৃঙ্খল, চারিত্রিক ও পার্থিব সম্পদে সমৃদ্ধ, ইস্পাত কঠিন ঐক্যবদ্ধ ও সুসভ্য একটি জাতিতে রূপান্তরিত করলেন, যাঁর মাধ্যমে ঐ জাতিটি অতি অল্প সময়ে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বিশ্বের সকল জাতির শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হলো, যিনি মানব ইতিহাসের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলেন, তাঁর এত বিরাট কৃতিত্ব যারা দেখে না, সেই মহাবিপ্লবী নবীর জীবনীতে মানুষ হিসাবে তাঁর সার্বিক সফলতার মহত্তম রূপ যাদের দৃষ্টিতে পড়ে না, বরং সেই মানুষটির ব্যক্তিগত, পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে যারা দিনরাত বিষোদগার করে বেড়ান, এমন স্থূলমস্কি, দৃষ্টিহীনদের ব্যাপারে কী-ই বা বলার আছে? এই ক্ষুদ্রতা শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে কীভাবে এলো সেটা ধর্মপ্রিয় মানুষেরা যদি হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করতেন তাহলে আর এই দৃষ্টিহীনদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ না হয়ে কীভাবে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনা যায় সে বিষয়ে যত্নশীল হতেন।

আদর্শিক লড়াইয়ের উপাদান আছে হেযবুত তওহীদের কাছেঃ

চলমান সংকটসমূহ মোকাবেলায় ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা জনগণের সামনে এনে ধর্মব্যবসায়ীদের অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। ধর্মের এই প্রকৃত শিক্ষা কোনো স্কুলেও নাই, মাদ্রাসায়ও নাই, আছে একমাত্র হেযবুত তওহীদের কাছে- এ কথা আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি এবং আমাদের সাধ্যমত সেটা আমরা সরকার, গণমাধ্যমসহ সর্বশ্রেণির মানুষের সামনে তুলে ধরছি। এ কাজে কোনো রাজনীতিক বা আর্থিক স্বার্থও আমাদের নেই। আমরা এমনকি এটাও চাই না যে, এই শিক্ষাকে জনকল্যাণে প্রচার করা হলে সেখানে হেযবুত তওহীদের নাম প্রচার করতে হবে বা যাঁর মাধ্যমে আমরা এই সত্য পেয়েছি, সেই মাননীয় এমামুয্যামানের নাম প্রচার করতে হবে। আমাদেরকে কোনো স্বীকৃতিও দেওয়ার দরকার নেই। তবু দেশের স্বার্থে এই সত্য শিক্ষাটি তুলে ধরা প্রতিটি সচেতন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য, যার যেখানে সম্ভব হয়। কেউ চাইলে তা নিজের নামেও যদি তা প্রচার করেন আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না।

বসন্তের টিকা যিনি তৈরি করেছেন তিনি কি তা কবরে নিয়ে গেছেন? তিনি তার এই সৃষ্টিকে মানব জাতির কল্যাণে দিয়ে গেছেন। স্যার স্যামুয়েল হ্যানিম্যান এবং তার অনুসারী হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা প্রতিটি হোমিও ঔষধ নিজেরা সুস্থ শরীরে দীর্ঘদিন খেয়ে তাদের দেহ-মনে সে-সব ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তারা মানব কল্যাণে মারাত্মক ব্যাধিকে দেহে ধারণ করে জীবন ত্যাগ করতেও ছিল সদা প্রস্তুত। হেযবুত তওহীদের সদস্যরাও যে কোনো পরিণতির জন্য প্রস্তুত হয়েই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সত্যাদর্শ প্রচার করে যাচ্ছে, কেবলই জাতির মুক্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির আশায়।

মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেম সমাজ ও তাদের প্রভাবাধীন ধর্মভীরু সাধারণ মানুষ যারা বাম আদর্শের অনুসারীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত। তারা সমাজতান্ত্রিকদের সবাইকে একচেটিয়াভাবে নাস্কি বলে মনে করে, কিন্তু সেটা সত্য নয়। সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী কিন্তু তারা ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে। প্রকৃত নাস্কি পৃথিবীতে খুব কমই আছে। আমরা মনে করি, আল্লাহ যদি চাইতেন সবাই আল্লাহর উপর ঈমান রাখবে সেটা আল্লাহ এক মুহূর্তেই করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ চান মানুষ তার যুক্তি-বিচার দিয়ে আল্লাহকে জেনে নিক। মানুষের আসল পরীক্ষাটাই হলো তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি (Free will)। নাস্কি বা আস্কি যে কোনোটি হওয়ার স্বাধীনতা আল্লাহই মানুষকে দিয়েছেন। তাই যারা বিশ্বাস করেন যে, নিখুঁত সৃষ্টি আছে কিন্তু তার কোনো স্রষ্টা নেই, তাদের এই বিশ্বাস করার স্বাধীনতা (Freedom of thinking) সংরক্ষণ করাও একজন প্রকৃত ধার্মিকের কর্তব্য। আল্লাহ যখন মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন সেই বৃষ্টি ধার্মিকের বাড়িতেও পড়ে, নাস্কিের বাড়িতেও পড়ে, আল্লাহদ্রোহীর বাড়িতেও পড়ে। আল্লাহপ্রদত্ত কোনো নেয়ামত থেকেই তারা কেউ বঞ্চিত হয় না, বৈষম্যের শিকারও হয় না। সুতরাং আল্লাহর এই উদারতা ধার্মিকেরও অনুসরণীয়।

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পরে ধর্মকে (যদিও সেটা প্রকৃত ধর্ম নয়) তাড়িয়ে যখন তথাকথিত এই পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হল, তখন তারা সুখের আশায় অর্থনৈতিক পুঁজিবাদি ব্যবস্থা চালু করল। কিন্তু ফলাফল কি হলো? এক শ্রেণির লোক অকল্পনীয় অর্থবিত্তের মালিক হয়ে গেল আরেক শ্রেণির লোক সীমাহীন কষ্টে জীবন যাপন করতে লাগল। কলকারখানাগুলোতে হাজার হাজার শ্রমিক মানবেতর জীবনযাপন করতে লাগল। তাদের জন্য অন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসার মৌলিক অধিকারগুলোও ছিল না। ইউরোপে তখন রোগ-শোকের ছড়াছড়ি। এই অবস্থা

দেখে তখনকার যারা সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন যেমন কার্ল মার্কস, লেনিন, হেগেলস, তারা ভেবেছেন কী করে এ থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া যায়। তখন তারা আবিষ্কার করলেন যে, সাম্যবাদী অর্থনীতি এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। তারা যখন এর প্রচার করলেন তখন মুক্তির পথ পাওয়া গেছে ভেবে হাজার হাজার মানুষ তাদের এ মতবাদটি গ্রহণ করলো। পরে সমাজতন্ত্রীরা তা সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে লাগল। এতে করে তাদের ব্যক্তিগত অনেক ক্ষতি হয়েছে, ভালো কাপড় পরতে পারেন নি, অনেকের শিক্ষাজীবন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, অনেককে না খেয়ে, না ঘুমিয়ে দিনের পর দিন থাকতে হয়েছে। এসব কিছুই তারা করেছেন শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজ গড়ার জন্য, মানবতার কল্যাণের জন্য, নিঃস্বার্থভাবে। যারা মানবতার কল্যাণের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন তাদের এই ত্যাগকে কি অস্বীকার করা সম্ভব? অবজ্ঞা করা সম্ভব? কখনো নয়। তারা মানুষকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারেন নি তার কারণ হলো রাস্তা ভুল, পথ ভুল। কিন্তু তারা চেষ্টা করেছেন। তাদের এই নিস্বার্থ আত্মত্যাগ শ্রদ্ধার দাবি রাখে। মানবতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে যারাই ত্যাগ স্বীকার করবে আমরা তাদের শ্রদ্ধা করি। আমরা ঘৃণা করি তাদের যারা রাষ্ট্রের সম্পদ লুট করে খায়, ধর্মকে বিক্রি করে খায়। কিন্তু এই সাম্যবাদী মতদর্শের যারা মেহনতি মানুষের জন্য সংগ্রাম করছেন তাদের সাথে প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর মিল রয়েছে। কাজেই এই আদর্শিক লড়াইয়ে বাম আদর্শের সৈনিকদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে। আমরা বলছি না যে, আপনাকে বিশেষ কোনো ধর্মে বিশ্বাসী হতে হবে। সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। মানুষকে বাঁচানোর জন্য জঙ্গিবাদ, ধর্মব্যবসা, স্বার্থের রাজনীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করা দরকার মোটিভেশন করা দরকার সেটা ত্যাগী মানুষদেরকে দিয়েই হবে। আমাদের ইহকালের সমস্যা তাই সমাধানটাও ইহকালের হিসেবেই করতে চাই। পবিত্র কোর'আনে আছে যার ইহকাল ভালো তার পরকালও ভালো।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, হিংসা প্রতিহিংসার জন্ম দেয়, প্রতিশোধ পাল্টা প্রতিশোধের জন্ম দেয়। সুতরাং পারস্পরিক বিষোদ্গার, আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ করে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। কাজেই আমাদের কথা হলো, আমাদের সমাজে কে ধার্মিক, কে ধর্মহীন, কে ধনী কে গরীব, বা কে কোন ধর্মের অনুসারী ইত্যাদি শ্রেণিভেদ না করে এক মঞ্চে এসে একত্রে বসে কয়েকটি বিষয়ে ঐকমত্য গঠন খুবই জরুরি যে আমরা সবাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, স্বার্থের রাজনীতির বিরুদ্ধে সবাই একজাতি একদেশ ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলব।

এক নজরে

হেযবুত তওহীদ

প্রতিষ্ঠাতা:

মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ পবিত্র শবে বরাতে টাঙ্গাইলের করটিয়ার বিখ্যাত জমিদার পন্নী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬ জানুয়ারি ২০১২ ঈসায়ী তারিখে তিনি এন্তেকাল করেন।

প্রতিষ্ঠা: ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫ ঈসায়ী; করটিয়া দাউদ মহল, টাঙ্গাইল।

উদ্দেশ্য এবং ধরন: সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংস্কারমূলক আন্দোলন যার মূল কাজই হলো মানবজাতিকে ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করা এবং মানবজাতির অশান্তির মূল কারণ দাজ্জালকে প্রতিহত করে সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (চূড়ান্ত সত্য, হক) প্রতিষ্ঠা করা।

কাঠামো: এমাম-আমীর-সদস্য। সদস্যদেরকে মোজাহেদ-মোজাহেদা বলা হয়ে থাকে

বর্তমান আনুগত্যের ধারাবাহিকতা:

হেযবুত তওহীদ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ স্বয়ং, তিনিই একে গত ১৯ বছর ধরে পরিচালনা করে আসছেন। এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ মানবজাতির মধ্য থেকে মাননীয় এমামুয্যামানকে এ যুগের নেতা হিসাবে মনোনীত করেছেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর থেকে আন্দোলনের এমাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থানাস্থ পোরকরা গ্রামের জনাব নুরুল হক সাহেব এর জ্যেষ্ঠ সন্তান, যামানার

এমামের আদর্শের উত্তরাধিকার জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। তাঁর জন্ম ১৯৭২ সনে। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএসএস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার কৃতীত্ব অর্জন করেন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ করেন। তিনি ২০১৩ সালের ২০ ডিসেম্বর এমামুয্যামানের ছোট মেয়ে রুফায়দাহ পন্নীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য:

- মানবজাতির বর্তমান সঙ্কট থেকে মুক্তির একমাত্র পথ স্রষ্টার বিধান। মুসলিম বলে পরিচিত এই জনসংখ্যাটিসহ সমস্ মানবজাতি আজ তার সমষ্টিগত জীবন মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থা দিয়ে পরিচালনা করছে। ফলে সমস্ পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নেই, মানুষের জীবন সংঘর্ষ, রক্তপাত, অন্যায়, অবিচারে পূর্ণ হয়ে আছে। মানুষের তৈরি বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র এ সমস্যাগুলোর সমাধান করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি বরং দিন দিন পরিস্থিতি আরো খারাপ হচ্ছে। হেযবুত তওহীদের বক্তব্য এই যে, শান্তি, ন্যায়, সুবিচার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ বর্তমান জীবনব্যবস্থা (System) বাদ দিয়ে স্রষ্টার, আল্লাহর দেওয়া জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তা সমষ্টিগত জীবনে কার্যকর করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।
- বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ইসলাম ধর্ম নামে যে ধর্মটি চালু আছে সেটা আল্লাহর প্রকৃত ইসলাম নয়। গত ১৪০০ বছর ধরে ধীরে ধীরে আল্লাহর প্রকৃত ইসলাম ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা বিকৃত ও বিপরীতমুখী হয়ে গেছে। আল্লাহ অতি দয়া করে তাঁর প্রকৃত ইসলাম যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়েছেন। হেযবুত তওহীদ সেই প্রকৃত ইসলামের ধারক।
- ধর্ম এসেছে মানবতার কল্যাণে। ধর্মের কোন বিনিময় চলে না। বিনিময় নিলে ধর্ম বিকৃত হয়ে যায়। কাজেই ধর্মের কাজ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে করতে হবে এবং বিনিময় নিতে হবে কেবল আল্লাহর কাছ থেকে।
- সহজ সরল সেরাতুল মোস্তাকীম দীনুল হক, ইসলামকে একদিকে পণ্ডিত, আলেম, ফকীহ, মোফাস্সেরগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বহু মতের সৃষ্টি করেছে। ফলে একদা অখণ্ড উম্মতে মোহাম্মদী হাজারো ফেরকা, মাজহাব, দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে আছে। অন্যদিকে ভারসাম্যহীন সুফিরা জাতির সংগ্রামী চরিত্রকে উল্টিয়ে ঘরমুখী, অন্তর্মুখী করে স্থবির, নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ করে দিয়েছে। ফলে একদা অর্ধ্ব-বিশ্বজয়ী দুর্বার গতিশীল যোদ্ধা জাতিটি আজ হাজার হাজার আধ্যাত্মিক তরিকায় বিভক্ত, স্থবির উপাসনাকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। অতি বিশ্লেষণকারী পণ্ডিত এবং বিকৃত সুফী এই উভয় শ্রেণির কাজের ফলে ইসলামের উদ্দেশ্যই পাল্টে গেছে। সংগ্রাম করে সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার বদলে ধর্মের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে আত্মার উন্নয়ন এবং জীবনের ব্যক্তিগত অঙ্গনের ছোট খাটো বিষয়ের মাসলা মাসায়েল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করা।
- ব্রিটিশরা এই জাতিকে পদানত করার পর এরা যেন কোনদিন আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে এজন্য একটি শয়তানি ফন্দি আঁটে। তারা এ জাতির মানুষের মন ও মগজকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য দু'টি সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করে, যথা: মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা। তাদের অধিকৃত সকল উপনিবেশেই তারা মুসলমানদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার নাম করে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানে তারা নিজেদের মনগড়া একটি বিকৃত-বিপরীতমুখী ইসলাম শিক্ষা দেয়। মাদ্রাসাগুলির অধ্যক্ষপদ তারা নিজেদের হাতে রেখে দীর্ঘ ১৪৬ বছর এই উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে তাদের তৈরি 'ইসলাম' শিক্ষা দিয়েছে। এখানে অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির কোন কিছুই রাখা হলো না, যেন মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে এসে আলেমদের রুজি-রোজগার করে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য এই দীন, ধর্ম বিক্রী করে রোজগার করা ছাড়া আর কোন পথ না থাকে। খ্রিষ্টানরা এটা এই উদ্দেশ্যে করল যে তাদের মাদ্রাসায় শিক্ষিত এই মানুষগুলো যাতে বাধ্য হয় দীন বিক্রী করে উপার্জন করতে এবং তাদের ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে বিকৃত ইসলামটা এই জনগোষ্ঠীর মন-মগজে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়; এ উপমহাদেশসহ খ্রিষ্টানরা তাদের অধিকৃত সমস্ মুসলিম দেশগুলিতে এই একই নীতি কার্যকর করেছে এবং সর্বত্র তারা একশ' ভাগ সফল হয়েছে।
- ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাটি তারা চালু করল স্কুল কলেজের মাধ্যমে। এ ভাগটা তারা করল এই জন্য যে, এ বিরাট এলাকা শাসন করতে যে জনশক্তি প্রয়োজন তা এদেশের মানুষ ছাড়া সম্ভব ছিল না; সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের কেরাণীর কাজে অংশ নিতে যে শিক্ষা প্রয়োজন তা দেওয়ার জন্য তারা এতে ইংরেজি ভাষা, সুদভিত্তিক অংক, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক, ইতিহাস (প্রধানতঃ ইংল্যান্ড ও ইউরোপের রাজা-রাণীদের ইতিহাস), ভূগোল, প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থাৎ পার্থিব জীবনে যা যা প্রয়োজন হয় তা শেখানোর বন্দোবস্ রাখল; সেখানে আল্লাহ, রাসুল, আখেরাত ও দীন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই রাখা হলো না, সেই সঙ্গে নৈতিকতা, মানবতা, আদর্শ, দেশপ্রেম ইত্যাদি শিক্ষাও সম্পূর্ণ বাদ রাখা হলো। তাদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হলো যাতে তাদের মন শাসকদের প্রতি হীনম্মন্যতায় আপ্লুত থাকে এবং পাশাপাশি তাদের মন-মগজে, আল্লাহ, রসুল, দীন সম্বন্ধে অপরিসীম অজ্ঞতাপ্রসূত বিদ্বেষ (A hostile attitude) সৃষ্টি হয়। বিশ্ব-রাজনৈতিক কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের খ্রিষ্টান শক্তিগুলি তাদের উপনিবেশগুলিকে বাহ্যিক স্বাধীনতা দিয়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় তারা ক্ষমতা দিয়ে যায় এই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণিটির উপর যারা চরিত্রে ও

আত্মায় ব্রিটিশদের দাস। ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া সেই শিক্ষাব্যবস্থা আজও চালু আছে। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী নামে খ্রিষ্টান হলেও তারা প্রকৃতপক্ষে ঈসা (আ.) এর অনুসারী ছিলো না। ঈসা (আ.) এর শিক্ষাকে বহু পূর্বেই তারা বাদ দিয়ে ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে।

- আল্লাহর রসুল আখেরি যামানায় যে এক চক্ষুবিশিষ্ট দানব দাজ্জালের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যাকে ঈসা (আ.) এন্টি ক্রাইস্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন, মাননীয় এমামুয্যামান সেই দাজ্জালকে হাদিস, বাইবেল, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোকে সন্দেহাতীতভাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতাই হচ্ছে দাজ্জাল। বর্তমানে সমগ্র মানবজাতি সেই দাজ্জালের তৈরি জীবনবিধান মেনে নিয়ে তার পায়ে সেজদায় পড়ে আছে। পরিণামে তারা একদিকে যান্ত্রিক প্রগতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করলেও মানুষ হিসাবে তারা পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে। সমগ্র মানবজাতি ঘোর অশান্তি, অন্যায়, অবিচারের মধ্যে ডুবে আছে। দাজ্জালের হাত থেকে পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহর হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই সংগ্রাম করে যাচ্ছে হেযবুত তওহীদ। আল্লাহর রসুল বলেছেন যে, যারা দাজ্জালকে প্রতিরোধ করবে তারা বদর ও ওহুদ দুই যুদ্ধের শহীদের সমান মর্যাদার অধিকারী হবে (আবু হোরায়রা রা. থেকে বোখারী মুসলিম)। হেযবুত তওহীদের যারা দাজ্জালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে তাদেরকেও আল্লাহ দুই শহীদ হিসাবে কবুল করে নিয়েছেন। যার প্রমাণস্বরূপ তিনি একটি বিরাট মো'জেজা হেযবুত তওহীদকে দান করেছেন। তা হলো: এই দাজ্জাল প্রতিরোধকারীরা মৃত্যুবরণ করলে তাদের দেহ শক্ত (রাইগরমর্টিস) ও শীতল হয়ে যায় না। জীবিত মানুষের ন্যায় নরম ও স্বাভাবিক থাকে।

মূলনীতি:

- হেযবুত তওহীদ চেষ্টা করবে আল্লাহর রসুলের প্রতিটি পদক্ষেপকে অনুসরণ করতে।
- হেযবুত তওহীদের কোন গোপন কার্যক্রম থাকবে না, সবকিছু হবে প্রকাশ্য এবং দিনের আলোর মত পরিষ্কার।
- হেযবুত তওহীদের কেউ কোন আইনভঙ্গ করবে না, অবৈধ অস্ত্রের সংস্পর্শে যাবে না, গেলে তাকে এমাম নিজেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দেবেন।
- যারা হেযবুত তওহীদের সদস্য নয়, তাদের থেকে কোনরূপ অর্থ গ্রহণ করা হবে না।
- হেযবুত তওহীদের কোন সদস্য কোন প্রচলিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে পারবে না।
- কর্মক্ষম কেউ বেকার থাকতে পারবে না, বৈধ উপায়ে রেযেক হাসিলের চেষ্টা করবে।

কর্মসূচি:

মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহান আল্লাহ যে কর্মসূচি তাঁর শেষ রসুলকে দান করেছিলেন, যে কর্মসূচি স্বয়ং আল্লাহর রসুল এবং তাঁর হাতে গড়া উম্মতে মোহাম্মদী অনুসরণ করেছিলেন সেই পাঁচ দফা কর্মসূচি অনুসরণ করেই হেযবুত তওহীদ সত্যদীন, দীনুল হক প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এই ৫ দফা কর্মসূচি তিনি তাঁর উম্মাহর উপর অর্পণ করার সময় বলছেন– এই কর্মসূচি আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন, এখন এটা তোমাদের হাতে অর্পণ করে আমি চলে যাচ্ছি। সেগুলো হলো :

(১) (সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে) ঐক্যবদ্ধ হও।

(২) (যিনি নেতা হবেন তার আদেশ) শোন।

(৩) (নেতার ঐ আদেশ) পালন করো।

(৪) হেযরত (অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে সম্পর্কত্যাগ) করো।

(৫) (এই দীনুল হক কে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করো। এখানে জেহাদ অর্থ: সর্বাত্মক চেষ্টা, প্রচেষ্টা।

যে ব্যক্তি এই ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও বহির্গত হলো, সে নিশ্চয় তার গলা থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেললো- যদি না সে আবার ফিরে আসে (তওবা করে) এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতার যুগের দিকে আহ্বান করল, সে নিজেকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করলেও, নামায পড়লেও এবং রোজা রাখলেও নিশ্চয়ই সে জাহান্নামের জ্বালানী পাথর হবে [আল হারিস আল আশয়ারী (রাঃ) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারাত, মেশকাত]।

প্রশিক্ষণ:

মানবতার মুক্তির জন্য নিঃস্বার্থভাবে নিজেদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে সংগ্রাম করে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন দৃঢ় চরিত্রবল, আত্মিক শক্তি, সবর, লক্ষ্যের প্রতি অবিচলতা (হানিফ)। সেই চরিত্র হতে হবে প্রধানত উপরোক্ত পাঁচ দফা ভিত্তিক অর্থাৎ তাদেরকে হতে হবে ইস্পাতের মত ঐক্যবদ্ধ, পিঁপড়ার মত সুশৃঙ্খল, স্রষ্টার পতি প্রকৃতির মত আনুগত্যশীল, সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীক, কঠোর, প্রতিবাদী, নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমী ও সংগ্রামী। এই চরিত্র অর্জনের জন্য হেযবুত তওহীদের প্রশিক্ষণ হচ্ছে সঠিক পদ্ধতিতে সালাহ কায়েম করা। বর্তমানে পৃথিবীতে যে সালাহ (বা নামাজ) চালু আছে সেটা আল্লাহ এবং রসুল প্রদত্ত সঠিক নিয়ম মেনে এবং সঠিক উদ্দেশ্যে করা হয় না। হেযবুত তওহীদকে আল্লাহ সালাতের সঠিক উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া দান করেছেন। সালাতের বাইরে হেযবুত তওহীদ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন শরীরচর্চামূলক খেলাকে (যেমন কাবাডি, ফুটবল, সাঁতার) উৎসাহিত করে থাকে।

পরিচালিত প্রতিষ্ঠান:

তওহীদ প্রকাশন, ৩১/৩২, পি.কে পুস্ক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

তওহীদ কাবাডি দল

৩৯/১, তেজকুনি পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

দৈনিক বজ্রশক্তি

বার্তা বাণিজ্যিক কার্যালয়-

২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা

ইলদ্রিম মিডিয়া

প্রবাস (৩য় তলা)

৭৩ উত্তর বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা।

বাংলাদেশের পত্র ডটকম (অনলাইন পত্রিকা)

jatiyatv.com (অনলাইন)

ওয়েবসাইট: hezbuttawheed.org

প্রকাশিত পুস্ক-পুস্কিা সমূহ

- ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা
- ইসলামের প্রকৃত সালাহ্
- দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান ‘সভ্যতা’
- Dajjal? The Judeo-Christian Materialistic 'Civilization'! (অনুবাদ)
- হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস
- আল্লাহর মো’জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা
- বর্তমানের বিকৃত সুফিবাদ
- ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা
- যুগসন্ধিক্ষণে আমরা
- বাঘ-বন-বন্দুক
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি যামানার এমামের পত্রাবলী
- বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দ:) এর ভাষণ
- ইসলাম শুধু নাম থাকবে
- যামানার এমামের পক্ষ থেকে মহাসত্যের আহ্বান
- এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব
- আসুন-সিস্টেমটাকেই পাল্টাই
- সকল ধর্মের মর্মকথা সবার ঊর্ধ্বে মানবতা
- চলমান সঙ্কট নিরসনে হেযবুত তওহীদের প্রস্াবনা
- Divide and Rule
- শোষণের হাতিয়ার
- জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই দাসত্ব
- দান: ইসলামের অর্থনীতির চালিকাশক্তি
- ধর্মব্যবসায়ী ও পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর ষড়যন্ত্রের যোগফল জঙ্গিবাদ- উত্তরণের একমাত্র পথ
- সাংবাদিকতার আদর্শলিপি
- ধর্মবিশ্বাস: এক বৃহৎ সমস্যার সহজ সমাধান।
- তাকওয়া ও হেদায়াহ

প্রকাশিতব্য পুস্ক-পুস্কিা সমূহ:

- The Lost Eslam
- Humanity: The essence of all religions
- Channeling faith: An easy solution to a complex problem
- প্রকৃত সনাতন ধর্ম।
- প্রকৃত ইসলামে নারী স্বাধীনতা।
- সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ ও ইসলাম।

প্রামাণ্যচিত্র

- একজাতি একদেশ ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ
- ধর্মব্যবসা ও ধর্ম নিয়ে অপ- রাজনীতির ইতিবৃত্ত

- নারীর মর্যাদা
- দাজ্জাল? ইহুদি-খৃস্টান 'সভ্যতা'!
- দাজ্জাল প্রতিরোধকারীদের সম্মান ও পুরস্কার
- আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা
- অন্যান্য দল না করে হেযবুত তওহীদ কেন করব?
- The Leader of the Time (গানের অ্যালবাম-সিডি)
- সকল ধর্মের মর্মকথা-সবার উর্ধ্বে মানবতা
- সন্ত্রাসবাদ
- ধর্মবিশ্বাস: এক বৃহৎ সমস্যার সহজ সমাধান।
- এক নজরে হেযবুত তওহীদ ও এমামুয্যামান

বৃহত্তম মাইলফলক:

২ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে মহান আল্লাহ এক মহান মোজেজা সংঘটন করেন যার দ্বারা তিনি তিনটি বিষয় সত্যায়ন করেন। যথা: হেযবুত তওহীদ হক (সত্য), এর এমাম আল্লাহর মনোনীত হক এমাম, হেযবুত তওহীদের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত হবে। (এনশা'ল্লাহ)

কর্মপ্রক্রিয়া:

হেযবুত তওহীদ রাষ্ট্রীয় আইনকে পূর্ণরূপে মান্য করে গত ১৯ বছর ধরে আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। মানবজাতিকে স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের দিকে আহ্বান করার জন্য হেযবুত তওহীদ মাননীয় এমামুয্যামানের বক্তব্য ও লেখা সম্বলিত হ্যান্ডবিল, বই, পত্রিকা, প্রামাণ্যচিত্র ইত্যাদি সর্বশ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকে। এরই অংশ হিসাবে বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে, রাস্পঘাটে এই প্রকাশনা সামগ্রীগুলি বিক্রয়, বই মেলায় স্টল গ্রহণ, শিল্পকলা একাডেমী, পৌর মিলনায়তন, জাতীয় প্রেসক্লাব, পাবলিক লাইব্রেরির সেমিনার কক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হল, জাতীয় যাদুঘরের সেমিনার কক্ষ, ঢাকা রিপোর্টারস ইউনিটিসহ বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের উপস্থিতিতে, প্রায় সকল ধর্মের সম্মানিত ব্যক্তি ও ধর্মগুরুদের নিয়ে মতবিনিময়ের মাধ্যমে, এমনকি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করে আমাদের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিতভাবে অবহিত করে থাকি এবং প্রকাশনাসমূহ দিয়ে আমাদের বক্তব্য সম্পর্কে জানিয়ে থাকি। হেযবুত তওহীদের প্রকাশনাগুলি আন্দোলন ও পত্রিকার ওয়েবসাইটগুলিতেও প্রকাশ করা হয়।

অর্থের উৎস:

হেযবুত তওহীদের সদস্যরা নিজেদের উপার্জিত বা অর্জিত সম্পদ ব্যয় করে আন্দোলনের কাজ করে থাকেন।

অনন্যতা:

হেযবুত তওহীদ গত ১৯ বছরে দেশের একটিও আইনভঙ্গ করে নি, এর কোন সদস্য একটিও অপরাধ করে নি। এর প্রমাণ গত ১৯ বছরে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ৪৫০টির অধিক মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে কিন্তু একটি মামলাতেও এর কোন একজন সদস্যেরও কোন আইনভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া যায় নি। আইন মান্য করার এরূপ দৃষ্টান্ত দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলির একটিও দেখাতে পারে নি।

সকল কাজে নারীদের অংশগ্রহণ:

রসুলাল্লাহর সময় যেমন পুরুষ আসহাবদের পাশাপাশি নারী আসহাবগণও জাতীয় ও সামাজিক প্রায় সকল কাজে অংশগ্রহণ করেছেন ঠিক তেমনি হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের প্রায় সকল কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অংশগ্রহণ করে থাকে। আমীরের দায়িত্ব থেকে শুরু করে

অফিসিয়াল কাজ, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কাজ (যেমন: প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কাজ, হিসাব রক্ষণ বিভাগের কাজ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি) এমনকি পত্রিকা, বই বিক্রির কাজেও নারীরা শরীয়াহ নির্ধারিত বিধি অনুসরণ করে পুরুষের সাথে অংশগ্রহণ করেন।

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড:

হেযবুত তওহীদ সুস্থ ধারার সংস্কৃতিকে লালন করে। এমামুয্যামানের স্মরণে হেযবুত তওহীদের প্রকাশিত প্রথম গানের অ্যালবাম "দ্য লিডার অব দ্য টাইম'। সেমিনারগুলিতে হেযবুত তওহীদের সদস্য-সদস্যারা যন্ত্রানুসঙ্গ সহযোগে সঙ্গীত পরিবেশন করে।

অপপ্রচার বা হয়রানি:

শুরু থেকে সত্যনিষ্ঠ আন্দোলন হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে প্রধানত দুটি শ্রেণি অপপ্রচার চালিয়েছে। তাদের একটা হলো ধর্মব্যবসায়ী আলেম মোল্লা শ্রেণি দ্বিতীয় হলো ইসলাম বিদ্বেষী এক শ্রেণির মিডিয়া। উভয় শ্রেণির সীমাহীন অপপ্রচারে সাধারণ মানুষ এবং প্রশাসন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ফলে সম্পূর্ণ আইনমান্যকারী আন্দোলন হেযবুত তওহীদের হাজার হাজার কর্মী অহেতুক হয়রানির শিকার হয়েছে।

আল্লাহ বলেছেন, ধর্মের নামে বিনিময় নেওয়া বৈধ নয়, এটি আগুন খাওয়ার শামিল। ধর্মের কাজ করতে হবে মানবতার কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে। ধর্মব্যবসায়ী মোল্লারা যখন দেখল এই মহাসত্যগুলি মাননীয় এমামুয্যামানের অনুসারীরা সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দিচ্ছে তখন তারা ভীত হয়ে পড়ল। তারা দেখল এভাবে চলতে থাকলে সাধারণ মানুষ ধর্মব্যবসার ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠবে, তাদের ধর্মবাণিজ্যে আঘাত লাগবে, রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য তারা মাননীয় এমামুয্যামানের বিরুদ্ধে, হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করল যে, হেযবুত তওহীদ ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা পেয়ে ইসলাম ধর্ম ধ্বংস করছে, ওরা কালো কাপড় দিয়ে লাশ দাফন করে, বসিয়ে কবর দেয়, এরা খ্রিষ্টান হয়ে গেছে, সুতরাং হেযবুত তওহীদের সদস্যদের মারলে নেকি হবে, জান্নাতে যাওয়া যাবে ইত্যাদি। তাদের এ সব কাল্পনিক, মস্তিষ্কপ্রসূত সব অপপ্রচারে ধর্মভীরু সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকেই প্রভাবিত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় অহেতুক হেযবুত তওহীদের সদস্যদের উপর হামলা, বাড়ি-ঘর ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ করেছে, মাঠের ফসল নষ্ট করে দিয়েছে, গাছ কেটে নিয়েছে, হয়রানি করার জন্য মিথ্যা তথ্য দিয়ে পুলিশকে প্রভাবিত করেছে। ধর্মব্যবসায়ীদের ইন্ধনে হেযবুত তওহীদের উপর যে হামলা হয়েছে তাতে এ পর্যন্ত হেযবুত তওহীদের দুইজন কর্মী শহীদ হয়েছেন, আর আহত হয়েছেন বহু সংখ্যক সদস্য-সদস্যা। অপরপক্ষে ইসলাম বিদ্বেষী এক শ্রেণির মিডিয়া যারা পশ্চিমাদের দ্বারা প্রভাবিত তারা হেযবুত তওহীদকে নিষিদ্ধ, জঙ্গি, সন্ত্রাসী, চরমপন্থী, গোপন ইত্যাদি বলে অবিশ্রান্তভাবে অপপ্রচার চালিয়েছে। অথচ হেযবুত তওহীদ এগুলির বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম কর্মী, সাধারণ মানুষ সকলের প্রতি আমাদের কথা হলো, অনুগ্রহ করে আমরা কী বলি, আমরা কী করি, আমরা কী দেখাই তা আপনারা দেখুন, শুনুন, জানুন। প্রায় সকল জেলায় আমাদের কর্মীগণ ছড়িয়ে রয়েছেন। আমাদের সকল কার্যক্রম উন্মুক্ত। আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের পরামর্শ দিন। আমাদের কোনো কথা অসামঞ্জস্যশীল বা তথ্যগত সমস্যা আছে মনে হলে আমাদের অবহিত করুন। আমরা মানবজাতির ঐক্য। আমরা চাই সমাজের বিরাজিত অন্যায়, অশান্তি দূর হোক। আমাদের অকপট চাওয়ার প্রতি সকলের সমর্থন কামনা করি।